পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ
Planning and Decision Making

ইউনিট ৩

ভূমিকা
ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার মৌলিক কার্যাবলির মধ্যে পরিকল্পনা হচ্ছে প্রথম ও মুখ্য কাজ। এটি একটি বিশেষ ধরনের সিদ্ধান্ত যা সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের সাথে সম্পর্কিত। ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ L.A. Allen বলেন, “Plan is the trap to capture the future” অর্থাৎ “পরিকল্পনা হলো ভবিষ্যতকে বন্দী করার একটি ফাঁদ”। শুধু ব্যবসা জগতেই নয়, পরিকল্পনা বিষয়টি সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ব্যবসায় জগতে, প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে পরিকল্পনা হচ্ছে লক্ষ্যভিত্তিক অগ্রযাত্রার পথিকৃত। এ ইউনিটে পরিকল্পনার ধারণা, বৈশিষ্ট্য, লক্ষ্য সম্পর্কিত ধারণা, লক্ষ্যের প্রকারভেদ এবং একটি উত্তম পরিকল্পনা প্রণয়নের কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। এছাড়া এ ইউনিট থেকে আপনি সিদ্ধান্ত গ্রহণের নানা খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কেও জানতে পারবেন। তাহলে আসুন, ইউনিটটি শেষ করে আমরা পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কে জেনে নিই।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১ : পরিকল্পনা – ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও লক্ষ্য
পাঠ-২ : পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপ ও প্রকারভেদ
পাঠ-৩ : উত্তম পরিকল্পনা
পাঠ-৪ : সিদ্ধান্ত গ্রহণ – ধারণা, প্রয়োজনীয়তা ও প্রক্রিয়া
পাঠ-৫ : সিদ্ধান্ত গ্রহণ – উপাদান ও বিবেচ্য বিষয়
পাঠ-৬ : সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন

পাঠ-৩.১ পরিকল্পনার ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও লক্ষ্য
Concept, Characteristics and Objectives of Planning

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পরিকল্পনার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলো বলতে পারবেন।

পরিকল্পনার ধারণা
Concept of Planning

পরিকল্পনা হলো ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের অগ্রিম সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি প্রক্রিয়া। অর্থাৎ ভবিষ্যতে কোন্ কাজ কখন, কিভাবে, কার দ্বারা সম্পাদন করা হবে, এসব বিষয়ের পূর্ব-নির্ধারিত কর্মসূচিকে পরিকল্পনা বলে।

পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার প্রথম ও প্রধান ধাপ। এটি ভবিষ্যৎ কার্যের একটি নক্সা বা প্রতিচ্ছবি। পূর্ব এবং বর্তমান অভিজ্ঞতা, পরিসংখ্যানিক তথ্যাদি এবং যুক্তিসঙ্গত কারণের উপর ভিত্তি করেই পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। অর্থাৎ ইতোপূর্বে কি ঘটেছে, কিরূপে ঘটেছে, কখন ঘটেছে এবং কতটুকু সুফলতা অর্জিত হয়েছে, তার উপর ভিত্তি করেই পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। পরিকল্পনায় প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন বিকল্প কর্মপন্থা থেকে উত্তম কর্মপন্থাটি বেছে নেওয়া হয়।

পরিকল্পনা প্রক্রিয়াটি চিত্রাকারে এভাবে দেখানো যায়

উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নির্ধারণ করা → বিকল্প কর্মপন্থা নির্ধারণ → সর্বোত্তম কর্মপন্থা বাছাই → লক্ষ্য অর্জন

নিচে পরিকল্পনা সম্পর্কে কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যবস্থাপনা বিশারদের মতামত দেওয়া হল ঃ

১. এইচ. অইরিচ ও এইচ. কুঞ্জ (H. Weihrich and H. Koontz)- এর মতে, 'ব্রত ও লক্ষ্য নির্বাচন এবং এগুলো অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের সাথে পরিকল্পনা জড়িত; এর জন্য প্রয়োজন সিদ্ধান্ত গ্রহণ অর্থাৎ বিকল্প কর্মপন্থা হতে উত্তম কর্মপন্থা নির্বাচন' (Planning involves selecting missions and objectives and the actions to achieve them; it requires decision making, that is, choosing future courses of action among alternatives)।

২. ডাব্লিউ.এইচ. নিউম্যান (*W. H. Newman*)- এর মতে, 'কি করা হবে সে বিষয়ে অগ্রিম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাকে পরিকল্পনা বলে' (Planning is deciding in advance what is to be done)।

৩. আর. এন ফার্মার ও ব্যারি এম. রিচম্যান (*R.N. Farmer & Barry M. Richman*)-এর মতে, 'সাংগঠনিক কোন কাজের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে পরিকল্পনা বলে' (The planning is the process of making decision for any phase of organisational activity)।

উপরের সংজ্ঞাসমূহের আলোকে আমরা বলতে পারি যে, প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ভবিষ্যতে কোন্ কাজ কখন, কার দ্বারা, কিভাবে সম্পাদিত হবে এ সম্পর্কে পূর্বঅভিজ্ঞতা ও প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গৃহীত কার্যসূচি প্রণয়নের প্রক্রিয়াই হলো পরিকল্পনা।

পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য
Features of Planning

পরিকল্পনা হচ্ছে ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের পূর্ব-নির্ধারিত কার্যসূচি। অর্থাৎ ভবিষ্যতে যে সব কাজ সম্পাদন করা হবে তা কখন, কিভাবে, কার দ্বারা সম্পাদিত হবে এ সব বিষয়ের আগাম সিদ্ধান্তই পরিকল্পনা। পরিকল্পনার কতকগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এগুলো নিচে আলোচনা করা হল :

১. **অগ্রিম সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Taking advance deision)**ঃ একজন ব্যবস্থাপক কি কাজ করবেন, কিভাবে করবেন, কখন করবেন এবং কাকে দিয়ে করাবেন- এসব বিষয়ে পরিকল্পনাকালে অগ্রিম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বাস্তব ক্ষেত্রে কার্য পরিচালনার সময় যাতে অনাকাঙ্খিত সমস্যার সৃষ্টি না হয় সেজন্য ভবিষ্যৎ কর্মসূচি সম্পর্কে অগ্রিম সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন।

২. **ভবিষ্যৎ কর্মসূচি প্রণয়ন (Formulating future programmes)**ঃ পরিকল্পনা ভবিষ্যৎ কর্মসূচির একটি নক্সা প্রণয়নের প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে কোন বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন প্রকার বিকল্প কর্মপন্থা নিরূপণ করা হয় এবং সেগুলো থেকে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা বাছাই করে বাস্তব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

৩. **মানসিক প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি (Creating mental portrait)**ঃ পরিকল্পনা একটি প্রতিষ্ঠানে বা প্রতিষ্ঠানের ভেতরে সংশ্লিষ্ট বিভাগে ভবিষ্যতের কর্মপন্থাসমূহের একটি মানসিক কাঠামো সম্পর্কে সুস্পষ্ট আভাস দেয়।

৪. **অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিফলন (Reflection of past experience)**ঃ সাধারণত পরিকল্পনা করার সময় পূর্বের অভিজ্ঞতার বিষয় গুরুত্ব দেওয়া হয়। একজন ব্যবস্থাপক যখন প্রতিষ্ঠানের জন্য পরিকল্পনা তৈরি করেন তখন তিনি অতীতের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগান। অতীতের অর্জিত ফলাফল বিবেচনায় রেখে পরিকল্পনা তৈরি করা হয়।

৫. **লক্ষ্য অর্জন (Achieving goal)**ঃ পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের একটি সুসংবদ্ধ প্রচেষ্টা। যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা প্রণীত হয়। তাই পরিকল্পনা প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের পথ সুগম করে।

৬. **অনিশ্চয়তা মোকাবেলা (Facing uncertainty)**ঃ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের একটি প্রধান লক্ষ্য থাকে। এটি অর্জনের জন্য অনেকগুলো সহায়ক উপ-লক্ষ্য (Sub-goals) সৃষ্টি করা হয়। এসব উপ-লক্ষ্য অর্জন করার পথে বহুবিধ অনিশ্চয়তা থাকতে পারে। অর্থাৎ অর্জিত না হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে। পরিকল্পনা প্রণয়নকালে এসব উপাদান বিবেচনায় রাখা হয়।

৭. **ব্যাপকতা (Comprehensiveness)**ঃ প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক বিভাগ ও সেকশনের জন্য আলাদা আলাদাভাবে পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রয়োজন হয় বলে পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরে প্রভাব বিস্তার করে।

৮. **পরিবর্তনশীল (Flexibility)**ঃ উদ্ভূত পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতি রেখে পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনার ব্যবস্থা রাখা হয়। নমনীয়তা উৎকৃষ্ট পরিকল্পনার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

কোন প্রতিষ্ঠানে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হলে উপরে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখতে হয়। জানা হলো পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য। এবার তাহলে আসুন আমরা লক্ষ্য কী সে সম্পর্কে জেনে নিই।

পরিকল্পনার লক্ষ্য
Goals in Planning

পরিকল্পনার প্রত্যাশিত ফলকে লক্ষ্য বলে। আমরা জানি যে, একটি প্রতিষ্ঠান কিছু কাঙ্ক্ষিত ফল পাবার জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করে। এটা অর্জনের জন্য প্রতিষ্ঠান মানবীয় ও অ-মানবীয় সকল প্রকার উপাদানগুলো কাজে লাগায়। লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। তাই লক্ষ্য ব্যবস্থাপনা কার্যাবলীর কেন্দ্রবিন্দু। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে। এ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড কীভাবে, কখন এবং কার দ্বারা সম্পাদন করা হবে সে জন্য পরিকল্পনা করতে হয়। W. H. Newman এর ভাষায়, লক্ষ্য প্রশাসনের নানাবিধ উদ্দেশ্য অর্জনে কাজ করে। অর্জনযোগ্য ফলাফলের বর্ণনাই লক্ষ্য (Plans expressed as a result to be acheived may be called goals)। লক্ষ্য হল ভবিষ্যতের কাঙ্খিত ফল বা প্রান্তিক ফল যা একটি প্রতিষ্ঠান অর্জন করতে চায়। লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা ও কৌশলই মূলত: পরিকল্পনা। এবার আসুন আমরা ব্যবস্থাপনার অন্যান্য কাজের সাথে এর সম্পর্ক জেনে নিই।

ব্যবস্থাপনার অন্যান্য কার্যাবলির সাথে পরিকল্পনার সম্পর্ক (Relationship between Planning and Other Functions of Management)

ব্যবস্থাপনা বহুবিধ কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান কাজ হচ্ছে- পরিকল্পনা, সংগঠন, কর্মীসংস্থান, নির্দেশনা, প্রেষণা, যোগাযোগ, সমন্বয়সাধান ও নিয়ন্ত্রণ। ‘পরিকল্পনা’ কার্য দিয়ে ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং সমাপ্তি

ঘটে ‘নিয়ন্ত্রণ’-এর মধ্য দিয়ে। ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াকে যদি আমরা একট সড়কের সাথে তুলনা করি, তাহলে পরিকল্পনা হল সড়কের প্রথম প্রান্ত (যাত্রা শুরুর স্থান) এবং নিয়ন্ত্রণ হল শেষ প্রান্ত (গন্তব্যস্থল)। এ দু’য়ের মাঝখানে অন্যান্য কার্যাবলির অবস্থান। পরিকল্পনা ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে; আর নিয়ন্ত্রণের চোখ থাকে অতীতের প্রতি। পরিকল্পনায় যা করার জন্য প্রস্তাব করা হয়, বাস্তবায়ন শেষে নিয়ন্ত্রণ তা মূল্যায়ন করে। মাঝখানের কাজগুলো পরিকল্পনার বাস্তবায়নে সহায়তা করে। অথবা বলা যায়, পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করে লক্ষ্য অর্জনের জন্য অন্যান্য কাজগুলো পরিচালিত হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পরিকল্পনার সাথে অন্যান্য ব্যবস্থাপকীয় কার্যাবলির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। সবগুলো কাজই পরিকল্পনার উপর নির্ভরশীল।

শিক্ষার্থীর কাজ	পরিকল্পনা প্রক্রিয়াটি চিত্রের সাহায্যে প্রদর্শন করুন।

সারসংক্ষেপ:

ব্যবস্থাপনা কার্যাবলীর ভেতর পরিকল্পনা হচ্ছে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কাজ। মূলতঃ পরিকল্পনা হচ্ছে ব্যবস্থাপনার অন্যান্য কার্যাবলীর ভিত্তিস্বরূপ। আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক হেনরী ফেয়ল সর্বপ্রথম পরিকল্পনাকে ব্যবস্থাপনার একটি স্বতন্ত্র কার্য হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন। পরিকল্পনা একটি প্রক্রিয়া যা কোন প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য স্থির করে এবং ঐ লক্ষ্য অর্জনের জন্য ভবিষ্যতে করণীয় সবচেয়ে সম্ভাব্য উপযুক্ত কর্মসূচি প্রণয়ন করে। অধ্যাপক হ্যারল্ড কুঞ্জ পরিকল্পনার মোট আটটি ধাপ বর্ণনা করেছেন। পরিকল্পনার ধাপসমূহ সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার মাধ্যমে আরম্ভ হয় এবং বাজেট করার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক্ চিহ্ন দিন-

১. পরিকল্পনার প্রত্যাশিত ফলকে কী বলে?
ক. কর্মসূচি | খ. কৌশল
গ. প্রকল্প | ঘ. লক্ষ্য

২. প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অর্পন করাকে কী বলে?
ক. বিকেন্দ্রীকরণ | খ. কেন্দ্রীকরণ
গ. কর্মবিভাজন | ঘ. সাম্যতা

৩. চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ কার্যাবলির অগ্রিম কর্মসূচি নির্ধারণ করে কোন্‌টি?
ক. পরিকল্পনা | খ. সংগঠিতকরণ
গ. সমন্বয়সাধন | ঘ. নিয়ন্ত্রণ

৪. ব্যবস্থাপনার মৌলিক কাজ কোন্‌টি?
ক. প্রতিবেদন প্রণয়ন | খ. যোগাযোগ
গ. প্রতিনিধিত্বকরণ | ঘ. পরিকল্পনা

পাঠ-৩.২ পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপ ও প্রকারভেদ
Steps and Types of Planning

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপ বর্ণনা করতে পারবেন।
- পরিকল্পনার প্রকারভেদ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

পরিকল্পনা প্রণয়নের পদক্ষেপসমূহ
Steps of planning

পরিকল্পনায় অনেকগুলো স্তর বা ধাপ রয়েছে। এগুলোকে পরিকল্পনার পদক্ষেপও বলা যায়। পরিকল্পনা প্রণয়ন করার সময় এ পদক্ষেপগুলোকে ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করা হয়। পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১. **সুযোগ বা সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হওয়া (Awareness of opportunities/problems)**ঃ পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রথম পদক্ষেপ হল কোন সুযোগ বা সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হওয়া। সুযোগ বা সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য অতীত ও বর্তমান অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে হয়। যে সমস্যা বা বিষয় নিয়ে পরিকল্পনা তৈরি করা হবে, সে সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা সৃষ্টি করার পর তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা প্রয়োজন।

২. **প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ (Collection of relevant information)**ঃ পরিকল্পনার সাথে জড়িত বিষয়াবলি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। পরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্যের প্রধান উৎসগুলো হল অতীত কাজের অভিজ্ঞতা, অতীতে সমাধানকৃত সমস্যাসমূহ, প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচি পর্যবেক্ষণ, দাপ্তরিক কাগজপত্র, গবেষণা, প্রতিবেদন ইত্যাদি। তথ্যের উৎসগুলো জোরদার হলে পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজটি সমৃদ্ধ হবে।

৩. **তথ্য বিশ্লেষণ (Analysis of information)**ঃ সংগৃহীত তথ্যাবলির মধ্যে শুধু প্রয়োজনীয় তথ্যগুলোই পরিকল্পনার জন্য গ্রহণ করতে হবে। বিশ্লেষণের জন্য তথ্যের শ্রেণীবিন্যাস ও সারণিকরণ প্রয়োজন। তথ্য বিশ্লেষণ সঠিক হলে সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব হবে।

৪. **প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য নির্ধারণ (Settings goals of the organisation)**ঃ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের একটা মূল লক্ষ্য থাকে। সেই লক্ষ্য কি হবে তা নির্ধারণ করা ব্যবস্থাপনার জন্য অত্যাবশ্যক। এ লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখেই প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কার্যাবলি পরিচালিত হয়। এ কারণে প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের মুল লক্ষ্য নির্ধারণ করা দরকার।

৫. **পরিকল্পনার অঙ্গন বা পটভূমি প্রতিষ্ঠা (Establishing planning premises)**ঃ পরিকল্পনার এ পর্যায়ে পরিকল্পনার পটভূমি প্রতিষ্ঠা করা হয়। ভবিষ্যতে যে সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্য দিয়ে পরিকল্পনা রচিত হবে সেগুলো সম্পর্কে ধারণা ঠিক করাকে পরিকল্পনার 'পটভূমি প্রতিষ্ঠা' বলা হয়। পটভূমি প্রণয়নের মাধ্যমে বিকল্প কর্মপন্থা সম্পর্কে জানা যায়।

৬. **বিকল্প কর্মপন্থা নির্ধারণ (Determining alternative courses of action)**ঃ পরিকল্পনা প্রণয়নকারীর অন্যতম দায়িত্ব হল পরিকল্পনার পটভূমি বা অঙ্গন প্রতিষ্ঠার পর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সম্ভাব্য কর্মপন্থাগুলো খুঁজে বের করা। সাধারণত একটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য একাধিক কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হয়। একাধিক হওয়ার কারণে এগুলোকে 'বিকল্প কর্মপন্থা' বলে। কর্মপন্থাগুলো একটি আরেকটির বিকল্প। অর্থাৎ একটি কর্মপন্থার পরিবর্তে আরেকটি কর্মপন্তা গ্রহণ করা হলে লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হতে পারে।

৭. **বিকল্প কর্মপন্থাসমূহ পর্যালোচনা (Analysis of alternative courses of action)**ঃ ষষ্ঠ ধাপে চিহ্নিত কর্মপন্থাগুলোর মধ্যে কোন্‌টি অধিক উপযোগী ও বাস্তবায়নযোগ্য তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা প্রয়োজন। সপ্তম ধাপে একটি বিকল্প আরেকটির তুলনায় শ্রেয়, না-কি নিকৃষ্ট এবং কেন শ্রেয় বা নিকৃষ্ট তা বিভিন্ন উপাদান বিশ্লেষণ করে দেখা হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সবচেয়ে বেশি বাস্তবায়নযোগ্য কর্মপন্থাকে পরবর্তীতে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা হয়।

৮. **উপযুক্ত কর্মপন্থা বাছাইকরণ (Selection of proper course of action)** ঃ বিভিন্ন বিকল্প কর্মপন্থা পর্যালোচনার পর কোন্‌টি প্রতিষ্ঠানের জন্য সবচেয়ে উপযোগী তা বাছাই করা হয়। এক্ষেত্রে ব্যবস্থাপককে যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হয় এবং বিজ্ঞাসম্মত কৌশলাদির প্রয়োগ ছাড়াও নিজের মেধা ও প্রজ্ঞা ব্যবহার করতে হয়। কারণ, এ পর্যায়েই চুড়ান্ত পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

৯. **গৌণ পরিকল্পনা প্রণয়ন (Preparing derivative plans)** ঃ এ পর্যায়ে ব্যবস্থাপককে মূল লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে মুল পরিকল্পনার প্রেক্ষাপটে কতিপয় গৌণ বা উপ-পরিকল্পনা তৈরি করতে হয়। মূল পরিকল্পনাকে সাপোর্ট করার জন্য গৌণ পরিকল্পনা তৈরি করা হয়।

১০. **পরিকল্পনাকে বাজেটে রূপান্তর (Budgeting)**ঃ গৌণ পরিকল্পনা প্রয়ণনের পরে এ ধাপে এসে গৃহীত পরিকল্পনাগুলোকে সংখ্যাত্মকরূপে বাজেটে পরিণত করা প্রয়োজন। তা হলেই পরিকল্পনা পূর্ণাঙ্গরূপ পায়। পরিকল্পনাকে সংখ্যায় প্রকাশ করা হলে তাকে বাজেট বলা হয়।

১১. **অনুবর্তন (Follow-up)**ঃ পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার সর্বশেষ পদক্ষেপ হল অনুবর্তন। পরিকল্পনা প্রণয়নকালে ইতোপূর্বে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলো সঠিকভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা, শেষ পর্যায়ে এ বিষয়টি দেখা হয়। অনুবর্তনকালে কোন প্রকার সমস্যা দেখা দিলে পরিকল্পনা প্রণেতারা তা সমাধানের জন্য উদ্যোগ নেন।

পরিকল্পনার প্রকারভেদ
Types of Plan

যে কোন প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। এগুলোকে তিনটি ভিত্তিতে বিভক্ত করা হয়। এগুলো নিচে আলোচনা করা হলঃ

প্রকৃতি বা ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ (Classification on the basis of nature or objective) ঃ

১. **ব্রত** (Mission)ঃ সাধারণত কারবারি প্রতিষ্ঠানের প্রধান ব্রত হলো পণ্য ও সেবার উৎপাদন ও বন্টন এবং এ সবের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য ব্রত নির্ধারণ করা প্রয়োজন। সাধারণত প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উদ্দেশ্য, মূল্যবোধ ও ধরণের উপর ভিত্তি করে ব্রত নির্ধারণ করা হয়।

২. **লক্ষ্য** (Goal)ঃ কোন প্রত্যাশিত ও সুনির্দিষ্ট ফল অর্জনের জন্য যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তাকে লক্ষ্য বলে। উদাহরণস্বরূপ, ২০২০ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে প্রশাসনিক ব্যয় ১০% কমাতে হবে - এটি একটি লক্ষ্য। লক্ষ্য একটি সুনির্দিষ্ট বিন্দুকে নির্দেশ করে। ফলপ্রসূ লক্ষ্য-এর পাঁচটি উপাদান থাকে: লক্ষ্য হবে সুনির্দিষ্ট (Specific), পরিমাপনযোগ্য (Measurable), যথোপযুক্ত (Appropriate), বাস্তবসম্মত (Realistic) এবং নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক (Time bound)। এগুলো সংক্ষেপে SMART হিসেবে পরিচিত।

৩. **স্থায়ী পরিকল্পনা** (Standing Plan)ঃ একই ধরনের সমস্যা বার বার উদ্ভূত হলে সেসব মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে দীর্ঘমেয়াদের জন্য যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তাকে স্থায়ী পরিকল্পনা বলে। অর্থাৎ কোন প্রতিষ্ঠানে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রণীত যে পরিকল্পনা একই ধরনের ক্ষেত্রে বার বার ব্যবহার করা হয়, তাকে স্থায়ী পরিকল্পনা বলা হয়। নীতি, পদ্ধতি, রীতি বা কাযপদ্ধতি স্থায়ী পরিকল্পনার আওতাভুক্ত। একটি সমস্যা সমাধান হয়ে গেলেই এ পরিকল্পনা ত্যাগ করা হয় না।

মেয়াদভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ (Classification on the basis of time)ঃ

১. **স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা (Short-term plan)**ঃ এ ধরনের পরিকল্পনা সাধারণত ১ বছর মেয়াদি বা আরও কম মেয়াদি হয়। স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা দুই প্রকারের হয়; যথা-এ্যাকশন প্লান ও রি-এ্যাকশন প্লান।

২. **মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা (Medium-term plan)**ঃ মধ্যম মেয়াদের পরিকল্পনা সাধারণত ১ বছর থেকে ৫ বছর মেয়াদী হয়ে থাকে। মধ্যম ও প্রথম স্তরের ব্যবস্থাপকদের জন্য এরূপ পরিকল্পনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৩. **দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা (Long-term plan)**ঃ এ ধরনের পরিকল্পনা সাধারণত ৫ বছরের বেশী সময়ের জন্য হয়ে থাকে। কোন কোন কোম্পানী ১৫/২০ বছরের জন্যও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা তৈরি করে থাকে।

কাঠামোভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ (Structrual classification)ঃ

১. **কার্যভিত্তিক পরিকল্পনা (Functional plan)**ঃ যে পরিকল্পনা প্রাতিষ্ঠানের কোন বিশেষ কার্য সম্পাদন করার জন্য তৈরি করা হয় তাকে কার্যভিত্তিক পরিকল্পনা বলে। যেমন-প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি বিভিন্ন কাজের জন্য আলাদা আলাদা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

২. **বিভাগীয় পরিকল্পনা (Departmental plan)**ঃ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের জন্য পৃথক পৃথক পরিকল্পনা তৈরি করা হলে সেগুলোকে বিভাগীয় পরিকল্পনা হিসেবে অভিহিত করা হয়।

৩. **আঞ্চলিক বা ভৌগলিক পরিকল্পনা (Regional or geographical plan)**ঃ সাধারণত দেশীয় বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলো বা বহুজাতিক কোম্পানীগুলো এ ধরনের পরিকল্পনা তৈরি করে থাকে। কারণ সারা দেশে এসব কোম্পানির কার্যক্রম বিস্তৃত। আঞ্চলিক বা ভৌগোলিক পরিকল্পনা হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অঞ্চল বা শাখার জন্য প্রণীত পরিকল্পনা।

৪. **সামগ্রিক পরিকল্পনা** (Master plan)ঃ প্রতিষ্ঠানে কেন্দ্রীয়ভাবে যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তাকে সামগ্রিক পরিকল্পনা বা মাস্টার প্লান বলে।

একার্থক পরিকল্পনা ও স্থায়ী পরিকল্পনার পার্থক্য

Differences Betweeen Single-Use Plan and Standing Plan

যে কোন প্রতিষ্ঠানে একই সাথে একার্থক ও স্থায়ী পরিকল্পনা বিরাজমান থাকতে পারে। দুটি দুই উদ্দেশ্যে দ্বিবিধ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় বলে একটি আরেকটি থেকে ভিন্ন প্রকৃতির, কিন্তু পরস্পর সম্পূরক। উভয় প্রকার পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্যগুলো নিচে দেওয়া হল :

একার্থক পরিকল্পনা

১. বিশেষ কোন একটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, তাকে একার্থক পরিকল্পনা বলে।
২. একার্থক পরিকল্পনার সাথে সমস্যার পৌনঃ পুনিকতার কোন সম্পর্ক নেই।
৩. এটি প্রতিষ্ঠানের বিশেষ অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে বিশেষ কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ব্যবহার করা হয়।
৪. প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হলে এর মেয়াদ শেষ হয়। এটি স্বল্পমেয়াদি।
৫. স্বল্পমেয়াদের জন্য হওয়ায় এ পরিকল্পনা অনমনীয়। অর্থাৎ এটিতে পরিবর্তনের সুযোগ কম।
৬. একার্থক পরিকল্পনায় একই ধরনের কাজ বার বার করার সুযোগ না থাকায় দক্ষতার উন্নয়ন বিঘ্নিত হয়।
৭. একার্থক পরিকল্পনা ব্যয়সাধ্য হওয়ার কারণে এটি সব ধরনের কাজের জন্য উপযুক্ত নয়।
৮. একার্থক পরিকল্পনা একবার ব্যবহৃত হওয়ার কারণে সবসময় কর্মীদের কাজ তদারকি করতে হয়।
৯. ব্যবসায়িক পরিবেশে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে। এই গতিশীল পরিবেশে একার্থক পরিকল্পনা অধিকতর উপযোগী।
১০. একার্থক পরিকল্পনায় বৈচিত্র আনয়নের সুযোগ অধিক। কারণ এক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় নতুন নতুন পরিকল্পনা প্রণীত হয়।
১১. নতুন নতুন প্রকল্পের জন্য পৃথক পৃথক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয় বিধায় বাস্তবায়ন ব্যয় বেশি হয়।

স্থায়ী পরিকল্পনা

১. একই ধরনের সমস্যা বার বার উদ্ভূত হলে তা মোকাবেলা করার জন্য যে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, তাকে বলা হয় স্থায়ী পরিকল্পনা।
২. পৌনঃপুনিক সমস্যা সমাধানের জন্য স্থায়ী পরিকল্পনা ব্যবহার করা হয়।
৩. বিশেষ কোন অস্বাভাবিক পরিস্থিতি বা ঘটনার কারণে পরিকল্পনার পরিবর্তনের প্রয়োজন না হলে একই পরিকল্পনা বার বার ব্যবহার করা হয়।
৪. স্থায়ী পরিকল্পনা হয় দীর্ঘমেয়াদী।
৫. দীর্ঘ মেয়াদি হওয়ায় স্থায়ী পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনের অবকাশ থাকে।
৬. স্থায়ী পরিকল্পনা বার বার ব্যবহার করা হয় বলে কর্মী ও ব্যবস্থাপকদের বিশেষ ধরনের সমস্যা সমাধানে দক্ষতা বদ্ধি পায়।

৭. স্থায়ী পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানের সব ধরনের কাজের জন্য ব্যবহার করা যায়।
৮. স্থায়ী পরিকল্পনা বার বার ব্যবহৃত হওয়ায় কর্মীদের কাজ তেমন একটা তদারক করার পয়োজন হয় না।
৯. স্থায়ী পরিকল্পনা দীর্ঘ মেয়াদেরদ জন্য প্রণীত হয় বিধায় তা পরিবর্তনশীল পরিবেশে কম উপযোগী।
১০. একই পরিকল্পনা বার বার ব্যবহৃত হওয়ায় বৈচিত্র্য থাকে না।
১১. একই পরিকল্পনা অধিক বার ব্যবহার করার ফলে সামগ্রিক ব্যয় কম হয়।

জানা হলো পরিকল্পনার প্রকারভেদ। এবার আসুন আমরা পরিকল্পনা প্রণয়নের গুরুত্ব বা সুবিধাগুলো জেনে নিই।

পরিকল্পনা প্রণয়নের সুবিধাসমূহ
Advantages of Planning

ভবিষ্যতে একটি প্রতিষ্ঠানে যে সব কর্মকাণ্ড ঘটতে পারে পূর্ব থেকে তা মানসিকভাবে চিন্তা-ভাবনা করাকে পরিকল্পনা বলা হয়। সে কারণে পরিকল্পনাকে ব্যবস্থাপনা কার্যাবলির প্রাণ বলা হয়ে থাকে। প্রাণের স্পন্দন না থাকলে যেমন হাত-পা, কান-নাক ইত্যাদি ইন্দ্রিয় অচল হয়ে যায়, তেমনি পরিকল্পনা না থাকলে ব্যবস্থাপনার অন্যান্য কাজ অর্থহীন হয়ে পড়ে। নানা কারণে একটি প্রতিষ্ঠানে পরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ণ। G. R. Terry পরিকল্পনার গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন- 'Planning enables the managers to avoid entropy or the tendency to let things run down." নিচে পরিকল্পনা প্রণয়নের সুবিধাসমূহ বিস্তারিত আলোচনা করা হলঃ

১. **পথ নির্দেশনা (Determining proper direction)ঃ** পরিকল্পনা ছাড়া প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা বুঝতে পারে না কিভাবে পরিবর্তনের প্রতি সাড়া দিতে হবে, কি পদ্ধতি গ্রহণ করে প্রতিকূল অবস্থায় সাফল্য আনতে পারবে কিংবা কোন্ পথে এগিয়ে গিয়ে বিরূপ পরিবেশকে করতলগত করতে পারবে। পরিকল্পনা কর্মীদের সঠিক কর্মপন্থা নির্দেশ করে। সে কারণে পূর্বে বলা হয়েছে, পরিকল্পনা হলো রাস্তার শুরু।

২. **লক্ষ্য অর্জন (Achieving goal)ঃ** ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে সুশৃঙ্খলভাবে কার্য পরিচালিত না হলে লক্ষ্য অর্জন করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

৩. **সুশৃঙ্খল কার্যের ভিত্তি (Base for disciplined work)ঃ** সুগঠিত ফাউন্ডেশন বা ভিত্তি ছাড়া যেমন একটি ভাল দালান নির্মাণ করা যায় না, ঠিক তেমনি ভালো পরিকল্পনা ছাড়া একটি প্রতিষ্ঠানের কাজের ভিত্তি সৃষ্টি হয় না। পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকীয় কার্যের মজবুত ভিত্তি তৈরি করে।

৪. **দক্ষতা বৃদ্ধি (Increasing efficiency)ঃ** প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মী সুস্পষ্ট নির্দেশনা না পেলে দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারে না। পরিকল্পনা না থাকলে কর্মীরা সুস্পষ্ট নির্দেশনা পায় না। ফলে তারা দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালনে অপারগ হয়।

৫. **সঠিক পথের সন্ধান (Guide for proper courses of action)ঃ** বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রণীত পরিকল্পনা ব্যবস্থাপকসহ বিভিন্ন কর্মীদের সঠিক পথের সন্ধান দেয়। পরিকল্পনা না থাকলে কর্মীবৃন্দ কখন, কোথায় ও কিভাবে তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবে সে ব্যাপারে মনস্থির করতে পারে না।

৬. **নিয়ন্ত্রণের পরিপূরক (Complementary to controlling)ঃ** প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রত্যেক ব্যবস্থাপককে তার অধীনস্থ কর্মীদের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করত হয়। আর এ নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি ভিত্তি থাকা প্রয়োজন, যার সাথে তুলনা করে ব্যবস্থাপক কর্মীদের প্রকৃত কার্য সম্পাদনের তুলনা করতে পারেন। তাই পরিকল্পনাকে নিয়ন্ত্রণের পরিপূরক হিসেবে অভিহিত করা হয়।

৭. **সীমিত সম্পদের ব্যবহার (Use of limited resource)ঃ** প্রতিষ্ঠানে সম্পদের পরিমাণ সাধারণত সীমিত থাকে। এ সম্পদের কাম্য ব্যবহার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব। আর সম্পদের কাম্য ব্যবহারের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন অপরিহার্য।

৮. **অনিশ্চিত পরিবেশ মোকাবেলা (Facing uncertain situation)ঃ** ব্যবসায়ে অনিশ্চয়তা প্রতি পদে ছায়ার মত বিরাজ করে। এ অনিশ্চয়তার কবল থেকে প্রতিষ্ঠানকে মুক্ত রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক।

৯. **সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তি (Base for decision making)**ঃ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পরিকল্পনা অত্যাবশ্যক। কারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় প্রাসঙ্গিক তথ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর এ তথ্যের ভিত্তিতেই পরিকল্পনা প্রণীত হয়। এ কারণে পরিকল্পনা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	একার্থক ও স্থায়ী পরিকল্পনা ৫টি পার্থক্য খাতায় লিখুন।

সারসংক্ষেপ:

পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় গৃহীত প্রত্যেকটি পদক্ষেপেই ব্যবস্থাপককে বিভিন্ন প্রকার তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয়। এসব তথ্যের উপর ভিত্তি করে তিনি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পূর্বানুমান করেন এবং ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য সম্ভাব্য ঘটনাবলি বিবেচনায় রেখে পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরি করেন। এ কারণে আহরিত তথ্যের গুণমানের উপর পরিকল্পনার গুণমান বহুলাংশে নির্ভরশীল। ব্যবস্থাপনায় পরিকল্পনাকে উহার বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা প্রকৃতির ভিত্তিতে, সময়ের ভিত্তিতে এবং ব্যবহারের মাত্রার ভিত্তিতে প্রণীত পরিকল্পনা। যেসব পরিকল্পনা একবার গৃহীত হবার পর বারবার ব্যবহৃত হয়, তাকে স্থায়ী পরিকল্পনা বলে। যেসব পরিকল্পনা শুধুমাত্র একবার বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত হয়, তাকে একার্থক পরিকল্পনা বলে। পরিকল্পনা কর্মীদের সঠিক কর্মপন্থা নির্দেশ করে। পরিকল্পনাকে নিয়ন্ত্রণের পরিপূরক হিসেবে গণ্য করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক্ চিহ্ন দিন-

১. কোন্‌টি স্থায়ী পরিকল্পনা?
   ক. পদ্ধতি   খ. প্রক্রিয়া
   গ. কর্মসূচি   ঘ. নীতি

২. কোনটি সময়ভিত্তিক পরিকল্পনার অংশ নয়?
   ক. স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা   খ. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা
   গ মধ্যমমেয়াদি পরিকল্পনা   ঘ. স্থায়ী পরিকল্পনা

৩. কোন্‌গুলো স্থায়ী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত?
   ক. নীতি   খ. অফিস আদেশ
   গ. প্রক্রিয়া   ঘ. কর্মসূচী।

৪. স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনার স্থায়ীত্বকাল কত বছর?
   ক. ১ বছর   খ. ২ বছর
   গ. ৩ বছর   ঘ. ৫ বছর

৫. মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনার স্থায়িত্বকাল কত বছর?
   ক. ১-৫ বছর   খ. ৬-৮ বছর
   গ. ১০-১২ বছর   ঘ. ১৩ বছরের সঠিক।

পাঠ-৩.৩ আদর্শ পরিকল্পনা
Ideal Plan

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আদর্শ বা উত্তম পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পরিকল্পনার সীমাবদ্ধতা বর্ণনা করতে পারবেন।

উত্তম বা আদর্শ পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য
Features of a Good or Ideal Plan

প্রতিষ্ঠান পরিচালনার মূল ভিত্তি হলো পরিকল্পনা। লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। এসব বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্রণীত পরিকল্পনাকে উত্তম বা আদর্শ পরিকল্পনা বলা যায়। আসুন আদর্শ পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে আলোচনা করি।

১. **সুস্পষ্ট লক্ষ্য (Clear-cut goal)ঃ** পরিকল্পনার লক্ষ্য সুনির্ধারিত হওয়া উচিত। নির্ধারিত লক্ষ্য না থাকলে পরিকল্পনার বাস্তবায়ন সঠিকভাবে সম্পন্ন হয় না।

২. **সহজবোধ্য (Easy understanding)ঃ** পরিকল্পনা যারা বাস্তবায়ন করেন তাদের কাছে এর বিষয়বস্তু বোধগম্য না হলে পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। এ কারণে পরিকল্পনাকে সহজ, সরল ও বোধগম্য করে তৈরি করতে হয়।

৩. **নিরবচ্ছিন্নতা (Continuity)ঃ** প্রতিষ্ঠান একটি চলমান প্রক্রিয়া। তাই একটি পরিকল্পনা সমাপ্ত হবার আগেই আরেকটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। কোন সময়ই যাতে প্রতিষ্ঠান পরিকল্পনাহীন হয়ে কাজের বিঘ্ন সৃষ্টি না করে সেজন্যই এরূপ অব্যাহত পরিকল্পনা দরকার।

৪. **নমনীয়তা (Flexibility)ঃ** ভবিষ্যত অনিশ্চিত। পরিবেশগত যে কোন পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে পরিকল্পনায় যাতে ভবিষ্যতে পরিবর্তন আনা যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। এ কারণে নমনীয়তা পরিকল্পনার একটি উল্লেখযোগ্য গুণ।

৫. **গ্রহণযোগ্যতা (Acceptability)ঃ** পরিকল্পনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষ প্রণীত পরিকল্পনা সহজে গ্রহণ করলে এর বাস্তবায়নও সহজ হয়। এ কারণে পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় অধস্তন শ্রমিককর্মীসহ সংশ্লিষ্টদের মতামত নিয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা দরকার। জাপানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা প্রণয়ন করার সময় অধস্তনদের মতামতের খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৬. **তথ্য নির্ভরতা (Dependency on information)ঃ** পরিকল্পনা অবশ্যই তথ্যনির্ভর ও সঠিক হতে হবে। অনুমানভিত্তিক তথ্যের ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রণয়ন করার কোন সুযোগ নেই।

৭. **ত্রুটিমুক্ততা (Free from errors)ঃ** একটি আদর্শ পরিকল্পনা অবশ্যই নির্ভুল হওয়া প্রয়োজন। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ও সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রণয়ন করলে তা বাস্তবায়ন করে সুফল পাওয়া যায়।

৮. **সমন্বয়সাধন (Coordination)ঃ** পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ ও উপবিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন হয়। কারো একক চিন্তায় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হলে প্রতিষ্ঠান কাঙ্খিত ফল লাভ করতে পারে না। সে কারণে সকলের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

৯. **আধুনিক প্রযুক্তি ও কৌশলের ব্যবহার (Use of modern technology and strategy)ঃ** বর্তমান ব্যবসায় জগত অত্যন্ত প্রতিযোগিতাপূর্ণ ও পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনশীল যুগে পরিকল্পনায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও নানা কলা-কৌশলের ব্যবহার করা প্রয়োজন। উন্নত প্রযুক্তি ও কৌশল পরিকল্পনার দ্রুত ও কার্যকর বাস্তবায়নে সহায়ক।

১০. **নির্দিষ্ট সময়সীমা (Specific time limit)**ঃ কোন্ কাজ কখন, কোন্ সময়ের মধ্যে সম্পাদন করা হবে তা নির্দিষ্টভাবে পরিকল্পনায় উল্লেখ থাকতে হবে।

১১. **মিতব্যয়িতা (Frugality)** ঃ অতিরিক্ত ব্যয় বর্জন করে অর্থাৎ মিতব্যয়িতার সাথে প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। কোন অবস্থাতেই ব্যয়বহুল পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যাবে না।

১২. **বাস্তবমুখী পরিকল্পনা (Realistic plan)**ঃ পরিকল্পনা অবশ্যই বাস্তবমুখী হতে হবে। অনুমাননির্ভর পরিকল্পনা কখনো সফলতা বয়ে আনতে পারে না।

উপরের বৈশিষ্ট্যাবলির আলোকে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হলে তাকে উত্তম বা আদর্শ পরিকল্পনা হিসেবে গণ্য করা হবে।

পরিকল্পনা প্রণয়নে সীমাবদ্ধতা
Limitations of Planning

প্রতিষ্ঠানে কতিপয় সীমাবদ্ধতার কারণে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রায়ই বিঘ্নের সৃষ্টি হয়। আসুন, সীমাবদ্ধতাগুলো বিস্তারিত জেনে নিই।

১. **সঠিক পূর্বানুমানের সমস্যা (Problem of correct forecasting)** ঃ ভবিষ্যত অনিশ্চিত বলে ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা পূর্বে সঠিকভাবে অনুমান করা যায় না। পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় আর্থিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার মূল্যায়ন করা সব সময় সঠিকভাবে করা সম্ভব হয় না। ফলে পরিকল্পনা তৈরিতে অনিশ্চিত বিষয়গুলো অসুবিধা সৃষ্টি করে।

২. **দ্রুত পরিবর্তনশীলতা (Rapid changeability)** ঃ বর্তমান যুগ পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির যুগ। উৎপাদন পদ্ধতির কথাই ধরুন। এক সময়ে এটি ছিল হস্তচালিত। বিজ্ঞানের বিবর্তনে অনেক দেশে তা এখন রোবট দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। ফলে প্রতিনিয়ত ব্যবস্থাপনার কৌশলে পরিবর্তন হচ্ছে। এ পরিবর্তনশীলতার কারণে পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় তা খাপ খাওয়াতে হয়।

৩. **পরিবর্তনে অনীহা (Disinterest in change)** ঃ নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয় বিধায় প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তাগণ অনেকেই পরিকল্পনার পরিবর্তনে আগ্রহী হন না। ফলে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিভিন্ন প্রকার সমস্যা দেখা দেয়।

৪. **অধিক ব্যয়সাধ্য (More expensive)** ঃ পরিকল্পনা প্রণয়ন একটি ব্যয়বহুল ব্যাপার। এটি তৈরির জন্য বিভিন্ন প্রকার তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। এছাড়া সংশ্লিষ্ট সবার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা, পরিকল্পনার খসড়া তৈরি করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ইত্যাদি কাজের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। তাই পরিকল্পনা প্রণয়নে অর্থ একটি বড় বাধা।

৫. **অপ্রাসঙ্গিক লক্ষ্য নির্ধারণ (Irrelevant goal setting)** ঃ প্রতিষ্ঠানের ব্রত (mission)-এর সাথে সঙ্গতি নয় এমন লক্ষ্য নির্ধারণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে আরেকটি বাধা। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় যদি আগামী বছর ১০% মুনাফা অর্জনের লক্ষ্য স্থির করে পরিকল্পনা প্রণয়ন করে, তা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্রতের সাথে সঙ্গতিহীন হবে।

৬. **সময় সাপেক্ষ (Time consuming)**ঃ একটি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলাদা আলাদা পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। এগুলোর ভিত্তিতে সামগ্রিক পরিকল্পনা তৈরি করতে হয়। এজন্য যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ব্যস্ততাজনিত কারণে অধিক সময় দিতে না পারলে পরিকল্পনা কার্যক্রম ব্যাহত হতে বাধ্য।

৭. **ঘটনার পৌনঃপুনিকতার অভাব (Lack of recurring events)**ঃ প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট অবস্থার প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হলে কাজের পৌনঃপুনিকতা বজায় থাকে না। পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে পরিকল্পনা, বিশেষ করে, স্থায়ী পরিকল্পনা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে না।

৮. **সংশোধনে সমস্যা (Problem in correction)**ঃ পরিকল্পনা প্রণয়নে অনেক ক্ষেত্রেই ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে থাকে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, ঘটনাবলি বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নজনিত সমস্যা, তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাব ইত্যাদি কারণে পরিকল্পনার সঠিক সংশোধন করা সম্ভব হয়ে উঠে না। ফলে পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়নও সম্ভব হয় না।

৯. **মনস্তাত্তিক প্রতিরোধ (Psychological resistence)**ঃ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিক-কর্মী পুরাতন ও প্রচলিত ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাচেতনায় অভ্যস্ত এবং তা ধরে রাখতেই বেশি উৎসাহী। তারা নতুন চিন্তাধারার আলোকে প্রণীত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে অনীহা প্রকাশ করে যা উত্তম পরিকল্পনা বাস্তবায়নে একটি বড় বাধা।

১০. **রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা (Political instability)**ঃ যে কোন দেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিঘ্নের সৃষ্টি করে। এছাড়া দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অবস্থার দ্বারাও পরিকল্পনা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়।

১১. **শ্রমিক সংঘ (Trade union)**ঃ শ্রমিক সংঘ অনেক ক্ষেত্রে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে বাধার সৃষ্টি করে। শ্রমিকদের মজুরি, তাদের কাজের শর্ত এবং বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অনেক ক্ষেত্রে কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।

উল্লিখিত বিষয়গুলো ছাড়া আরও কিছু বিষয় রয়েছে যা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। এদের মধ্যে দেশের শিল্পনীতি ও বাণিজ্যনীতি, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সমস্যা, উদ্যোগ গ্রহণে বাধা ইত্যাদির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	একটি আদর্শ পরিকল্পনার ১০টি বৈশিষ্ট্য খাতায় লিখুন।

সারসংক্ষেপ:

উত্তম পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করেই ব্যবস্থাপনার অন্যান্য কাজ সম্পাদিত হয়। উত্তম পরিকল্পনার অবশ্যই নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকতে হবে। ইহা অবশ্যই সহজবোধ্য, নিরবচ্ছিন্ন, নির্ভুল ও নমনীয় হবে। এটি অবশ্যই তথ্য-নির্ভর হবে। পরিকল্পনার লক্ষ্য সুনির্ধারিত ও সুস্পষ্ট হওয়া উচিত। পরিকল্পনা যারা বাস্তবায়ন করেন তাদের কাছে এর বিষয়বস্তু বোধগম্য না হলে পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। পরিকল্পনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষ প্রণীত পরিকল্পনা সহজে গ্রহণ করলে এর বাস্তবায়নও সহজ হয়। পরিকল্পনা অবশ্যই তথ্যনির্ভর ও সঠিক হতে হবে। পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ ও উপবিভাগের মধ্যে সমন্বয়সাধনের প্রয়োজন হয়। বর্তমান ব্যবসায় জগত অত্যন্ত প্রতিযোগিতাপূর্ণ ও পরিবর্তনশীল। অতিরিক্ত ব্যয় বর্জন করে অর্থাৎ মিতব্যয়িতার সাথে প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। পরিকল্পনা অবশ্যই বাস্তবমুখী হতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক্ চিহ্ন দিন-

১. কোন্‌টি পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য বহির্ভূত?
ক. সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য খ. সমতা রক্ষা
গ. মিতব্যয়িতা ঘ. অনমনীয়তা

২. কোন্‌টিকে কেন্দ্র করে সমগ্র পরিকল্পনা প্রক্রিয়া আবর্তিত হয়?
ক. রীতি খ. নীতি
গ. পদ্ধতি ঘ. লক্ষ্য

৩. কোন্‌টি পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য নয়?
ক. সুস্পষ্ট লক্ষ্য খ. নমনীয়তা
গ. মিতব্যয়িতা ঘ. মালিকের ব্যক্তিগত বিষয়

৪. অনেক কর্মী পরিকল্পনা পরিবর্তনে আগ্রহী হয় না; কারণ
ক. মুনাফা কমে যায় খ. দায়িত্ব বেড়ে যায়

পাঠ-৩.৪ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঃ ধারণা, প্রয়োজনীয়তা ও প্রক্রিয়া

Decision Making: Concept, Importance and Process

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধারণা
Concept of Decision Making

সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যবস্থাপনার কাজের দ্বিতীয় কাজ। সুযোগ কাজে লাগানোর কতিপয় বিকল্প কর্মপন্থা থেকে বিচার-বিবেচনার মাধ্যমে একটি উত্তম কর্মপন্থা নির্বাচন করা হয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যম। ধরুন, আন্তর্জাতিক বাজারে সুতার মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। একজন টেক্সাইল ম্যানেজারকে এ অবস্থায় বসে থাকলে চলবে না। তাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ কাজের কতিপয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এবার আসুন সেগুলো জেনে নিই।

১. কোনো সমস্যার সমাধান বা সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। মনে রাখবেন, সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি উদ্দেশ্য/লক্ষ্য অর্জনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

২. সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে মূল সমস্যা চিহ্নিত ও তার ব্যাখ্যা করা হয়। এতে বিষয়টি সকলের কাছে স্পষ্ট হয়।

৩. সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে সমাধানের মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়।

৪. সমাধানের জন্য বিকল্প কর্মপন্থা চিহ্নিত করারা পর সেগুলো মূল্যায়ন করা হয়।

৫. বিকল্প কর্মপন্থা থেকে সর্বোত্তম বিকল্পটি বাছাই করা হয় এবং এরপর

৬. গৃহীত কার্যক্রমের ফলপ্রসূতা মূল্যায়ন করা হয়।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের বৈশিষ্ট্য জানা হলো। এবার আসুন, এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জেনে নেই।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা
Importance of Decision Making

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তার যথাযথ বাস্তবায়নই একটি প্রতিষ্ঠানের সাফল্য এনে দেয়। ব্যবসায় সম্প্রসারণ, অর্থসংস্থান এবং উৎপাদন ব্যবস্থার বৈচিত্র্যকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ আবশ্যক। একজন ব্যবস্থাপক যা কিছু করেন তা তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমেই করেন। সুতরাং সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুরুত্ব অপরিসীম। নিচে সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুরুত্ব বিস্তারিত আলোচনা করা হলোঃ

১। সাংগঠনিক সমস্যার সমাধান: একজন ব্যবস্থাপক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটি বুদ্ধিদীপ্ত এবং যৌক্তিক প্রক্রিয়া। সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একজন ব্যবস্থাপককে কৌশলের পাশাপাশি তার বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হয়। পরিবেশ এবং পারিপার্শ্বিকতা সম্বন্ধেও তাকে সজাগ থাকতে হয়।

২। সঠিক কর্মপদ্ধতি অনুসরণ: ব্যবস্থাপকীয় কাজ সম্পাদনের জন্য একাধিক কর্মপদ্ধতি বিদ্যমান থাকলেও কোনো নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে সর্বোত্তম কর্ম পদ্ধতিটি বেছে নিতে হয়। বলা বাহুল্য, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সঠিক কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করতে হয় এবং পরে তা অনুসরণ করে পরবর্তী কার্য সম্পাদন করতে হয়।

৩। সম্পদের যথার্থ ব্যবহার: সম্পদের কাম্য ব্যবহার এবং মিতব্যয়ী হওয়া একটি যুগপৎ ঘটনা। সঠিক পরিস্থিতিতে যুৎসই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়, আবার সম্পদের অপচয়ও রোধ করা যায়।

৪। গতিশীলতা সৃষ্টি: ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটি চলমান প্রক্রিয়া। বর্তমানে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের জন্য আসন্ন কোনো সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য ব্যবস্থাপকগণ বিভিন্ন গাণিতিক মডেল ব্যবহার করে, গবেষণা করে এবং নিজস্ব বিচার বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এতে করে ব্যবস্থাপকদের মধ্যে সৃজনশীলতার উন্মেষ ঘটে।

৫। সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহার: ক্রিকেট খেলায় ব্যাস্টসম্যান সময়মত ব্যাট না চালালে নির্ঘাৎ কূপোকাত। ফলে অনেক খেসারত দিতে হয়। ব্যবসা ক্ষেত্রেও গৃহীত সময়োচিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দ্বারাই সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব। সময়মত সিদ্ধান্ত না নেওয়া হলে ম্যানেজারকে তার খেসারত দিতে হয় অনেক বেশি।

৬। উদ্দেশ্য অর্জন: একটি প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিবেদিত। লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটি অনিবার্য হাতিয়ার। প্রতিষ্ঠানের সকল ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে যথাযথ কর্মপদ্ধতি নির্বাচন করে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা হয় যাতে করে দক্ষতা এবং ফলপ্রদতার সাথে প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জিত হয়।

৭। প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার: একটি চলমান প্রতিষ্ঠানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া। বর্তমান যুগটি প্রযুক্তির যুগ। তাই বিভিন্ন কৌশলের পাশাপাশি কম্পিউটারে গাণিতিক মডেল ব্যবহার করে ঝুঁকিপূর্ণ এবং অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত।

৮। অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি: প্রতিষ্ঠানের সকল পর্যায়ের সাথে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে তা বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতা পাওয়া যায়। এতে গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন সহজ হয়, সকলের অংশগ্রহণের কারণে মানবিক সম্পর্কেরও উন্নয়ন ঘটে।

৯। তাৎক্ষণিক সমাধান: সমস্যা উপস্থিত হওয়া মাত্রই ব্যবস্থাপকগণকে সংশ্লিষ্ট সমস্যা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

১০। সৃজনশীলতার বিকাশ: সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অনেক সময় গাণিতিক মডেল ব্যবহারের কারণে কর্মীদের মধ্যে সৃজনশীল মনোভাবের সৃষ্টি হয়। এতে প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মী ও ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

১১। প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন: সিদ্ধান্ত গ্রহণে নির্বাহীদের পাশাপাশি অধীনস্তরা অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। ফলে তারা বিভিন্ন কলাকৌশল আয়ত্ত করে এবং নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ পায়। এতে তারা প্রশিক্ষণের সুযোগ পায় এবং তাদের ব্যক্তিক উন্নয়নও ঘটে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটি চলমান বিষয়। এ প্রক্রিয়ায় সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে নিয়োজিত কর্মীগণ আলাপ-আলোচনা করে সর্বোত্তম পদ্ধতিটি বাছাই ও নির্বাচন করলে ব্যবস্থাপকদের পক্ষে অধিকতর সফলতার সাথে সমস্যা মোকাবিলা করা সম্ভব হয়। জানা হলো, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা। এবার আসুন, এর প্রক্রিয়া সম্পর্কে জেনে নিই।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া

কতিপয় বিকল্প থেকে একটিকে বেছে নেওয়ার কাজই হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। সে কারণে এটি একটি ব্যাপক প্রক্রিয়া। একাধিক বিকল্প থেকে কোনো একটি বেছে নেওয়ার জন্য সমস্যা চিহ্নিতকরণ, বিভিন্ন বিকল্প উদ্ভাবন ও মূল্যায়ন, সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, কর্মপন্থা গ্রহণ এবং ফলাফল মূল্যায়নসহ পুরো প্রক্রিয়াই হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কতগুলো পর্যায়ক্রমিক পদক্ষেপ অনুসরণ করতে হয়। নিচের চিত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অনুসৃত পদক্ষেপসমূহ উল্লেখ করা হলো:

ধাপ-৯ অনুবর্তন ও মূল্যায়ন
ধাপ-৮ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন

ধাপ-৭ যথাযথ বিকল্প গ্রহণ
ধাপ-৬ বিকল্পসমূহ মূল্যায়ন
ধাপ-৫ বিকল্প কর্মপন্থা নির্ধারণ
ধাপ-৪ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ
ধাপ-৩ অগ্রাধিকার নির্ধারণ
ধাপ-২ সমস্যার শ্রেণিবিভাগ
ধাপ-১ সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সংজ্ঞায়িতকরণ

চিত্র: সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদক্ষেপসমূহ

১। সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সংজ্ঞায়িতকরণ: প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যতে প্রত্যাশিত বিষয়বস্তু- এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করাই হলো প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা। এ ক্ষেত্রে সমস্যা খুঁজে বের করতে হবে এবং সমস্যা নির্ণয়পূর্বক সম্ভাব্য সমাধান বের করাও জরুরী।

২। সমস্যার শ্রেণিবিভাগ: সমস্যা চিহ্নিত ও সংজ্ঞায়িত করার পর সমস্যাগুলোকে প্রকৃতি অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ করা হয়। শ্রেণিবিভাগ সঠিক না হলে কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

৩। অগ্রাধিকার নির্ধারণ: কোন কোন সময় প্রতিষ্ঠানে একসাথে কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এক্ষেত্রে জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

৪। তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ: এ পর্যায়ে সমস্যা সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে। অতঃপর সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্তকে প্রয়োজনের নিরিখে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে হবে। উপাত্তের যথার্থতা এবং পর্যাপ্ততা সম্পর্কে অধিকতর যত্নশীল হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। বিকল্প কর্মপন্থা নির্ধারণ: তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের পরে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কতিপয় বিকল্প কর্মপন্থা স্থির করতে হয়। সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে একজন নির্বাহীকে উদ্ভাবনী শক্তি, বিরূপ পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা, অন্তর্দৃষ্টি, দূরদৃষ্টি এবং অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করতে হয়।

৬। বিকল্পসমূহ মূল্যায়ন: ইতিপূর্বে স্থিরকৃত বিকল্পসমূহকে এ পর্যায়ে মূল্যায়ন তথা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। মূল্যায়নের মানদণ্ড হতে পারে কারিগরি এবং অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা, গুণগত মান, ফলপ্রদতা, প্রতিষ্ঠানের অপরাপর অংশের ওপর আলোচ্য বিকল্পের প্রভাব প্রভৃতি। তবে নিচের চারটি মানদণ্ড অনুযায়ী বিকল্পসমূহ মূল্যায়ন করতে হবে, যেমন- প্রত্যাশিত ফলাফলের সাথে ঝুঁকির অনুপাত, ফলাফলের সম্ভাব্যতা, সুবিধা এবং প্রচেষ্টার মধ্যে সামঞ্জস্য এবং প্রাপ্ত সম্পদের সীমাবদ্ধতা ও পরিমাণ। বিকল্প মূল্যায়নে গাণিতিক পদ্ধতিও ব্যবহার করা যায়।

৭। যথাযথ বিকল্প গ্রহণ: বিকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে একজন ব্যবস্থাপক তিনটি মৌলিক পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন, এগুলো হচ্ছে- অভিজ্ঞতা, পরীক্ষা এবং গবেষণা ও বিশ্লেষণ। যদি কোনো সিদ্ধান্ত গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে নেওয়া হয়, তখন একজন ব্যবস্থাপক তার ব্যক্তিগত প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা কিংবা অনুমান প্রয়োগ করে সঠিক কর্মপন্থা গ্রহণ করতে পারেন। ক্ষেত্রবিশেষ কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য একাধিক গ্রহণযোগ্য বিকল্প রাখা যেতে পারে।

৮। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন: যথাযথ বিকল্প নির্বাচনের পরে এ পর্যায়ে সেটিকে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়। সিদ্ধান্তের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পদ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সাথে পরামর্শকরণ, দায়িত্ব ও কর্তব্যের যথাযথ বণ্টন এবং বিভিন্ন অংশের মধ্যে সমন্বয় সাধন একান্ত প্রয়োজন। সিদ্ধান্ত কর্মীদের নিকট গ্রহণযোগ্য না হলে বাস্তবায়ন কঠিন হয়ে পড়ে।

৯। অনুবর্তন ও মূল্যায়ন: সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার শেষ ধাপ হলো সিদ্ধান্তের ফলাফল মূল্যায়ন। গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দ্বারা আশানুরূপ ফল অর্জিত হচ্ছে কি-না এ পর্যায়ে তা মূল্যায়ন করার চেষ্টা করা হয়। যদি দেখা যায় যে, গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দ্বারা সমস্যার কার্যকর সমাধান হচ্ছে না, তাহলে ইতিপূর্বে নির্ধারিত ২য় কিংবা ৩য় বিকল্প কর্মপন্থা গ্রহণ করেও কখনো কখনো সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়।

ব্যবস্থাপকদের নিজস্ব চিন্তা-চেতনা, অভিজ্ঞতা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিচারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হলেও স্বাভাবিক অবস্থায় উপরিউক্ত পদক্ষেপসমূহ অনুসরণের মাধ্যমে একটি উত্তম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার ৯টি ধাপ খাতায় ছক আকারে লিখুন।

সারসংক্ষেপ:

সিদ্ধান্ত গ্রহণ হলো একটি ব্যবস্থাপকীয় কাজ। এর দ্বারা কোনো সমস্যা সমাধান বা সুযোগ কাজে লাগানোর দুই বা ততোধিক বিকল্প কর্মপন্থা থেকে সচেতনতা, বুদ্ধিমত্তা ও বিচার-বিবেচনার মাধ্যমে একটি উত্তম কর্মপন্থা চিহ্নিত করে তা গ্রহণ করা হয়। এর দ্বারা কোনো সমস্যা সমাধান বা সুযোগ কাজে লাগানোর কতিপয় বিকল্প কর্মপন্থা থেকে বিচার-বিবেচনার মাধ্যমে একটি উত্তম কর্মপন্থা নির্বাচন করা হয়। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমাদেরকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তার যথাযথ বাস্তবায়নই একটি প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের চাবিকাঠি। ব্যবসায় সম্প্রসারণ, অর্থসংস্থান এবং উৎপাদন ব্যবস্থার বৈচিত্র্যকরণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ আবশ্যক। সাধারণভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ হলো কতিপয় বিকল্প থেকে একটিকে বেছে নেওয়া। সে কারণে এটি একটি ব্যাপক প্রক্রিয়া।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক্ চিহ্ন দিন-

১. সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হলো-
i. সমস্যা চিহ্নিতকরণ
ii. বিকল্পসমূহ উদ্ভাবন
iii. উত্তম বিকল্প গ্রহণ
নিচের কোন্‌টি সঠিক?
ক. i ও ii　　খ. i ও iii
গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৩.৫ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঃ উপাদান ও বিবেচ্য বিষয়
Decision Making: Elements and Considerable Factors

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কিত উপাদান ও বিবেচ্য বিষয় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সহায়তাকারী উপাদান/বিবেচ্য বিষয়সমূহ
Factors to Consider in Decision Making

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনাকে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন বিকল্প সিদ্ধান্ত হতে সর্বোত্তম সিদ্ধান্তটিকে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করে থাকে। বস্তুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যতিরেকে ব্যবস্থাপনা কার্যাবলি সুষ্ঠু ও সাফল্যজনকভাবে সম্পাদন করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে সঠিক সিদ্ধান্তের ওপর ব্যবসায়ের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভরশীল। শ্রম ব্যবস্থাপনা পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন দূরূহ হয়ে পড়ে। যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে কতগুলো উপাদান বিবেচনা করতে হয়। নিচে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপাদানসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হলোঃ

১। তথ্য ও উপাত্ত: একসময় বলা হতো জ্ঞানই শক্তি। এখন বলা হচ্ছে, 'তথ্যই শক্তি'। প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক তথ্য-উপাত্তই কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূল ভিত্তি। Input খারাপ হলে Output খারাপ হবে। তথ্য-উপাত্ত প্রাসঙ্গিক এবং সঠিক না হলে তার ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্তের অবস্থাও হবে নাজুক। তথ্য-উপাত্ত নির্ভরশীল হলে সিদ্ধান্ত নির্ভরযোগ্য হয়।

২। প্রজ্ঞা ও জ্ঞান: মানুষের স্বতস্ফূর্ত জ্ঞান ও অনুভূতিকে প্রজ্ঞা বলে। যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্বাহীর প্রজ্ঞা ও জ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রজ্ঞা বা দূরদর্শিতা সিদ্ধান্ত গ্রহণে সফলতা নিয়ে আসে। জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী একজন নির্বাহী সমস্যাকে মুনি-ঋষির মতো অবলোকন করতে সক্ষম হন এবং সমস্যার বাস্তব সমাধান দিতে পারেন। অধিক ফলপ্রসূ ব্যবস্থাপকগণই অধিক প্রজ্ঞাবান হয়ে থাকেন। ব্যবস্থাপক প্রজ্ঞা, জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা এবং দূরদর্শিতা প্রদর্শন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য অর্জন সহজতর হয়। কারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি একটি দক্ষ মানসিক প্রক্রিয়া।

৩। সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা: সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতা বলতে যথাযথভাবে সমস্যা ও সুযোগ চিহ্নিতকরণ এবং সংজ্ঞায়িতকরণ, অতঃপর সুযোগের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের কর্মপন্থা নির্ধারণের সামর্থ্যকে বোঝায়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা সার্বিক ব্যবস্থাপকীয় দক্ষতার অংশ হলেও এটিকে একটি স্বতন্ত্র নৈপুণ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রশিক্ষণ এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এই দক্ষতা অর্জিত হয়।

৪। প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি: প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসেবে কোনো বিষয়ে কর্মীদের সাধারণ বিশ্বাস, মনোভাব, কৌশল, মূল্যবোধ প্রভৃতি উপাদানের দ্বারা প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। প্রতিষ্ঠানভেদে এটি পৃথক হয়ে থাকে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এটি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে। কোনো প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান সংস্কৃতি বিবেচনায় আনলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয় এবং গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ত এবং কার্যকর অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা পাওয়া যায়। কর্মীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

৫। মানসিক দৃঢ়তা: ব্যবসায় পরিস্থিতি প্রায়ই ঝুঁকিপূর্ণ কিংবা অনিশ্চিত। নিশ্চিত পরিবেশে নৈমিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সাহস বা মানসিক দৃঢ়তার বিশেষ কোনো আবশ্যকতা নেই। ঝুঁকিপূর্ণ কিংবা অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান অবলম্বন হচ্ছে মানসিক দৃঢ়তা। ভীরু-দুর্বল ব্যবস্থাপক মানেই একজন আড়ষ্ট-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ; লোকসানের আশঙ্কায় সাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণে তিনি অক্ষম। মানসিক দৃঢ়তাসম্পন্ন একজন ব্যবস্থাপক প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম।

৬। ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব: সিদ্ধান্ত গ্রহণ মূলত একটি দায়িত্ব। দায়িত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। যথোপযুক্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী নয়– এমন নির্বাহীর পক্ষে কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নয়। যখন দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব দুটি ভিন্ন বিভাগের মধ্যে বিরাজ করে, তখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা জটিল হয়ে দাঁড়ায় এবং এক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ধীরগতিসম্পন্ন হয়। এমনকি লোকেরা তাদের কর্তৃত্বের বাইরে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাজি না হলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বন্ধ হয়ে যায়। তাই উপযুক্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ছাড়া সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। মূলত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অন্যতম ভিত্তি ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব। সাধারণত শিল্পনীতি, সরকার প্রদত্ত ক্ষমতা, প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-নীতির মাধ্যমে ব্যবস্থাপকের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপক পর্যাপ্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী হলে সঠিক সময়ে কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হবে।

৭। দক্ষ লোকবল: কর্মী বাহিনীর দক্ষতার দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন প্রভাবিত হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় একদিকে সমস্যা চিহ্নিতকরণ, প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণের জন্য দক্ষ লোকবল প্রয়োজন, অন্যদিকে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্যও দক্ষ এবং যোগ্যতাসম্পন্ন লোকবল আবশ্যক।

৮। অভিজ্ঞতা: কাজের মাধ্যমে একজন নির্বাহী বা কর্মী যে বাস্তব জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করেন তা-ই অভিজ্ঞতা। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সকল পর্যায়ে এটি সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপকগণ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও ধারণা রাখেন। তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে উত্তম ও কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজতর হয়। তাই ছোট-বড় যেকোনো প্রতিষ্ঠানে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের পরামর্শে সিদ্ধান্ত গ্রহণ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৯। সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়কালের পরিস্থিতি: সিদ্ধান্ত গ্রহণকালের পরিস্থিতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। তাই ব্যবস্থাপকদেরকে পরিস্থিতি কতটুকু ঝুঁকিপূর্ণ প্রথমে তা বুঝে নিতে হয়। কোন একটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় যদি মনে হয় যে, যে পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে হবে তা ঝুঁকিপূর্ণ, তা হলে তাকে ঝুঁকির বিষয়গুলো মাথায় নিয়েই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

১০। সহযোগিতা: ফলপ্রসূ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তার সফল বাস্তবায়ন আবশ্যিকভাবে একটি দলগত কাজ এবং অনিবার্যভাবে একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। সংশ্লিষ্ট সকলের সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমেই কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং গৃহীত সিদ্ধান্তের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা সম্ভব। কেননা ব্যবস্থাপক ও অধঃস্তনদের পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া সিদ্ধান্তের সফল বাস্তবায়ন সম্ভবপর নয়। এক্ষেত্রে অধঃস্তনদের সাথে পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে সিদ্ধান্তের ফলপ্রসূ বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

১১। সময়োপযোগিতা: সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অন্যথায় সর্বক্ষেত্রে ব্যর্থতা আসতে পারে। যেমন: শীতের পোশাক বাজারে ছাড়ার সিদ্ধান্ত যদি গ্রীষ্মকালে নেওয়া হয় তবে তা সফল হতে পারে না। ব্যবস্থাপককে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সময়োপযোগিতার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

১২। নমনীয়তা: পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে গৃহীত সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে তা পরিবর্তনের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। সাধারণত পর্যবেক্ষণ ও ফলাবর্তনের মাধ্যমে সিদ্ধান্তের কার্যকারিতা পরিমাপ করে প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা যায়।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উল্লিখিত উপাদানসমূহ সতর্কতার সাথে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে তা একটি কার্যকর ও ফলপ্রসূ সিদ্ধান্ত হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, যা প্রতিষ্ঠানের সফলতা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	

সারসংক্ষেপ:

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনাকে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন বিকল্প সিদ্ধান্ত হতে সর্বোত্তম সিদ্ধান্তটিকে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করে থাকে। বস্তুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যতিরেকে ব্যবস্থাপনীয় কার্যাবলি সুষ্ঠু ও সাফল্যজনকভাবে সম্পাদন করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে সঠিক সিদ্ধান্তের ওপর ব্যবসায়ের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভরশীল। সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটি জটিল কাজ। তাই যে কোনোভাবে ব্যবস্থাপকদের পক্ষে কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না। এ ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশ, আর্থিক সামর্থ্য ও শক্তি, সম্ভাব্য সুযোগ-সুবিধা ও সম্ভাবনা বিবেচনা করে ব্যবস্থাপনপকগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যবস্থাপনার কোন্ কাজের অন্তর্ভুক্ত?
   ক. সংগঠন
   খ. নির্দেশনা
   গ. পরিকল্পনা
   ঘ. নেতৃত্ব

২. পরিকল্পনার বিবেচ্য বিষয় কোন্‌টি?
   ক. অতীত অভিজ্ঞতা
   খ. পারিপার্শ্বিক অবস্থা
   গ. ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা
   ঘ. কোনটিই নয়।

৩. সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তাকারী কোন্ উপাদানটি মানুষের অন্তর্নিহিত বিষয়?
   ক. তথ্য
   খ. পদমর্যাদা
   গ. জ্ঞান
   ঘ. মুনাফা অর্জন

৪. কোন্‌টি সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তাকারী উপাদান?
   ক. সমনীয়তা
   খ. অভিজ্ঞতা
   গ. নিরবিচ্ছিন্ন
   ঘ. মিতব্যয়িতা

পাঠ-৩.৬ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমস্যা ও সমাধান
Problems and Solutions in Decision Making and Implementation

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কী কী সমস্যার উদ্ভব হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নকালে উদ্ভূত সমস্যাবলি চিহ্নিত করতে পারবেন।
- সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নকালে উদ্ভূত সমস্যাবলির সমাধানকল্পে গৃহীত ব্যবস্থাগুলো আলোচনা করতে পারবেন।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যাবলি ও সমাধানের পন্থাসমূহ
Problems and Solutions in Decision Making and Implementation

কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর যেকোনো প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সফলতা নির্ভর করে। তাই সিদ্ধান্ত হতে হবে সঠিক, সময়োচিত এবং কার্যকর। নিশ্চিত পরিবেশে নৈমিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ কিছুটা সহজ হলেও ঝুঁকিপূর্ণ এবং অনিশ্চিত পরিবেশে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অত্যধিক জটিল। অসংখ্য চলক এর সঙ্গে জড়িত। সঠিক সময়ে সমস্যা এবং সুযোগ চিহ্নিতকরণে ব্যর্থতা, প্রাসঙ্গিক তথ্য ও উপাত্তের অভাব কিংবা পর্যাপ্ততা, সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্তের ভুল বিশ্লেষণ এবং অপব্যাখ্যা, বিকল্প কর্মপন্থা মূল্যায়নে সক্ষম না হওয়া প্রভৃতি কারণে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে সমস্যা হয়ে থাকে। নিচে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্যাসমূহ তুলে ধরা হলো:

১। **সমস্যা কিংবা সুযোগ চিহ্নিতকরণে ব্যর্থতা:** সমস্যা বা সুযোগকে সঠিক সময়ে, সঠিক প্রেক্ষাপটে চিহ্নিত করতে না পারাই কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূখ্য অন্তরায়। সমস্যা চিহ্নিতকরণে ভুল হলে গৃহীত সিদ্ধান্তও ভুল হতে বাধ্য। ভুল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সমস্যা দূরীভূত না হয়ে বরং ঘনীভূত হয়।

২। **ব্যবস্থাপকীয় দক্ষতার অভাব:** প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ব্যবস্থাপকীয় দক্ষতা প্রয়োজন। একজন অজ্ঞ, অদক্ষ, অপরিপক্ব কিংবা প্রশিক্ষণবিহীন কর্মীর পক্ষে যথাযথভাবে পরিস্থিতি অনুধাবন, সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সংজ্ঞায়িতকরণ কিংবা বিকল্প কর্মপন্থা নির্ধারণ করার মতো জটিল কাজ সম্পাদন একেবারেই অসম্ভব। এ কারণেই অদক্ষ নির্বাহী কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত সাধারণত ফলপ্রসূ হয় না।

৩। **পর্যাপ্ত তহবিলের অভাব:** সুদক্ষ লোকবল থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় পর্যাপ্ত তহবিলের অভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও তা বাস্তবায়ন করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। সিদ্ধান্ত গৃহণের জন্য বাজার গবেষণা, ভোক্তা জরিপ কিংবা সম্ভাব্যতা যাচাই খুবই ব্যয়বহুল কর্মকাণ্ড। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমাদের দেশের রুগ্ন শিল্প কিংবা অর্ধসমাপ্ত শিল্প স্থাপনার এমন দুরবস্থার অন্যতম কারণও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত তহবিলের অভাব।

৪। **সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনীহা:** সিদ্ধান্ত সর্বদাই ভবিষ্যৎমুখী। তাই ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা এর সম্ভাব্য সহচর। ঝুঁকি গ্রহণে অনিচ্ছুক নির্বাহী সম্ভাব্য ঝুঁকির ভয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন।

৫। **সহযোগিতার অভাব:** সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সুপরামর্শ এবং সক্রিয় সহযোগিতা যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তার বাস্তবায়নের জন্য একান্ত জরুরি। আত্মাভিমানী নির্বাহী অন্যের পরামর্শ উপেক্ষা করেন; উপেক্ষিত কর্মীও সহযোগিতার হাত গুটিয়ে রাখেন। ফলে না-হয় সঠিক সিদ্ধান্ত, না-হয় তার যথাযথ বাস্তবায়ন।

৬। **অসময়োচিত সিদ্ধান্ত:** অনেক সময় সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী নির্বাহী সিদ্ধান্ত গ্রহণ কিংবা বাস্তবায়নের সময় সম্পর্কে অবগত থাকেন না। মনে রাখতে হবে যে, সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্তই যথাযথ সিদ্ধান্ত হিসেবে বিবেচিত হয় এবং এ ধরনের সিদ্ধান্তই সাফল্যের চাবিকাঠি। ভুল সময়ে সঠিক সিদ্ধান্তও ভুল সিদ্ধান্তের শামিল, এবং এর বাস্তবায়ন ক্ষেত্র বিশেষে সম্ভব হলেও ফলাফল অনাকাঙ্ক্ষিত।

৭। আবেগের প্রভাব: সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটি যৌক্তিক প্রক্রিয়া হলেও এর পটভূমি হয়ে থাকে রূঢ় বাস্তব। মস্তিষ্কজাত যুক্তিই এর কৌশল। এ কারণেই হৃদয়জাত ভাবাবেগের ঠাঁই এতে নেই। আবেগের আতিশয্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর যুক্তিবোধ এবং বিচারক্ষমতা লোপ পায়। আবেগতাড়িত সিদ্ধান্ত অনিবার্যভাবে অযৌক্তিক এবং অবাস্তব হয়ে থাকে।

৮। কারিগরি ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব: বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অনেক সময় আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে অবগত থাকেন না। এতে সঠিক ও কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেতে উপরিউক্ত সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে। এগুলো দূর করতে পারলেই কেবল সিদ্ধান্ত গ্রহণ সফল ও ফলপ্রসূ হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত বিষয়গুলো সমস্যার সৃষ্টি করে। এগুলো দূর করা গেলে বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজ হবে এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত থেকে কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়া যাবে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমস্যার সমাধান
Solutions of the Problems in Decision Making and Implementation

সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কতিপয় সমস্যা বা প্রতিবন্ধকতা থাকতে পারে, যা দূর করতে না পারলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ফলপ্রসু হবে না। নিচে উল্লিখিত উপায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা বা প্রতিবন্ধকতা দূর করে এ প্রক্রিয়াকে সাবলীল করা যায় ঃ

১। সমস্যায় চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা: সাহসী ও প্রাজ্ঞ ব্যবস্থাপকেরা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা দেখা দিলে সেটিকে চ্যালেঞ্জ হিসবে গ্রহণ করে এবং সমস্যা মোকাবিলায় কী করতে হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়। তারা বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া অনুসরণ করেন। এ ক্ষেত্রে অন্তত তিনটি বিষয় বিবেচ্য তারা বিবেচনা করে; যেমন (ক) তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা; (খ) হুমকি বা সুযোগের গুরুত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া এবং (গ) কতটুকু দ্রুততার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তা নির্ধারণ করা। এগুলোর আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সফল হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

২। পর্যাপ্ত বিকল্প অনুসন্ধান: বিভিন্ন প্রকার পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিকল্পসমূহের জন্য পর্যাপ্ত তথ্য চিহ্নিতকরণ ও সংগ্রহ করা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের জন্য কষ্টকর। তথাপি সিদ্ধান্তের ফলপ্রসূতার জন্য যতদূর সম্ভব তা করতে হবে। বিকল্পসমূহ চিহ্নিতকরণ ও মূল্যায়নের জন্য যে সকল তথ্যের প্রয়োজন, সেগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় ও সময় বিবেচনা করে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

৩। সিদ্ধান্ত গ্রহণে ক্ষতিকর প্রপঞ্চক এড়িয়ে যাওয়া: ক্ষতিকর প্রপঞ্চক বলতে বোঝায় সে-ই সকল চলক যা গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বাধার সৃষ্টি করে। একবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর পুনরায় পূর্বগৃহীত সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হতে পারে। যদি দেখা যায় যে, পূর্বে গৃহীত সিদ্ধান্ত তেমন কার্যকর হচ্ছে না, তাহলে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো একজন নির্বাহীকে নিয়োগ দেওয়ার পর দেখা গেল যে, তিনি কাঙ্ক্ষিত কাজ সম্পাদন করতে পারছেন না। এমতাবস্থায়, তাকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। এরপরও যদি তার কার্যক্রম সন্তোষজনক না হয়, তা হলে পুনরায় সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এই যে পুনরায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, এটি প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। তাই এ সকল বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

৫। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পরামর্শ গ্রহণ: যথার্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অনেক সময় সম্ভাব্য বাস্তবায়নকারীদের সাথে আলোচনা করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে যারা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবে তাদের সাথে পরামর্শ ও আলোচনা করলে যেমনি সিদ্ধান্তের মান বাড়ে, তেমনি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কার্যকর সহযোগিতা পাওয়া যায়। এ ছাড়া বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে ভুল-ত্রুটি শনাক্ত করে তা সংশোধনের মাধ্যমে কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়।

৬। যথাসময়ে সিদ্ধান্ত অবহিতকরণ: যথাসময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নকারীদের যথাসময়ে অবহিতকরণ করা আবশ্যক। কেননা স্বার্থ-সংশ্লিষ্টদের যথাসময়ে তা অবহিত করলে পরবর্তী বাস্তবায়ন কার্যক্রম ফলপ্রসূ হয়।

৭। **কার্যকর তত্ত্বাবধায়ন ও নিয়ন্ত্রণ:** সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন নিশ্চিত ও সফল করার জন্য সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার অসংগতি বা ভুলভ্রান্তি পরিলক্ষিত হলে প্রয়োজনীয় সংশোধনের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা আবশ্যক। যে সব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সময়সাপেক্ষ সে ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়কাল নির্ধারণপূর্বক নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা হলে কার্যকর ফল পাওয়া যাবে। ফলে প্রতিষ্ঠানে সৃষ্ট সম্ভাব্য সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া সহজতর হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	

সারসংক্ষেপ:

কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর যেকোনো প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য বাস্তবায়নের সফলতা নির্ভর করে। তাই সিদ্ধান্ত হতে হবে সঠিক, সময়োচিত এবং কার্যকর। নিশ্চিত পরিবেশে নৈমিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ কিছুটা সহজ হলেও ঝুঁকিপূর্ণ এবং অনিশ্চিত পরিবেশে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অত্যধিক জটিল। অসংখ্য চলক এর সঙ্গে জড়িত। সমস্যা বা সুযোগকে সঠিক সময়ে, সঠিক প্রেক্ষাপটে চিহ্নিত করতে না পারাই কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূখ্য অন্তরায়। প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ব্যবস্থাপকীয় দক্ষতা প্রয়োজন। সিদ্ধান্ত সর্বদাই ভবিষ্যৎমুখী। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সুপরামর্শ এবং সক্রিয় সহযোগিতা যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তার বাস্তবায়নের জন্য একান্ত জরুরি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক্ চিহ্ন দিন-

১. কোন্ ধরনের পরিকল্পনায় নমনীয়তার অভাব অধিক মাত্রায় লক্ষ্য করা যায়?
ক. একার্থক পরিকল্পনা খ. স্থায়ী পরিকল্পনা
গ. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ঘ. কার্যভিত্তিক পরিকল্পনা

২. কোন্ পর্যায়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়?
ক. পরিকল্পনার পটভূমি স্থাপন খ. সম্ভাব্য সুযোগ ও সমস্যা নির্ধারণ
গ. সর্বোত্তম বিকল্প নির্বাচন ঘ. উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠা

৩. কোন্টির গাণিতিক প্রকাশকে বাজেট বলে?
ক. সংগঠনের খ. নির্দেশনার
গ. সমন্বয়ের ঘ. পরিকল্পনার

৪. কোন্ পরিকল্পনা ব্যবস্থাপকের কর্মভার লাঘব করে?
ক. একার্থক পরিকল্পনা খ. স্থায়ী পরিকল্পনা
গ. মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা ঘ. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা

৫. মেট্রোরেল তৈরির পরিকল্পনা কোন্ ধরনের পরিকল্পনা?
ক. স্থায়ী পরিকল্পনা খ. কার্যভিত্তিক পরিকল্পনা
গ. একার্থক পরিকল্পনা ঘ. বিভাগীয় পরিকল্পনা

বর্ণনামূলক প্রশ্ন (Descriptive Questions)

১. পরিকল্পনা বলতে কি বোঝেন? পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করুন।
২. পরিকল্পনার সংজ্ঞা দিন। একটি উত্তম বা আদর্শ পরিকল্পনার গুণ বা বৈশিষ্ট্য লিখুন।
৩. পরিকল্পনার গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
   অথবা, পরিকল্পনা কি? পরিকল্পনার গুরুত ব্যাখা করুন।
৪. পরিকল্পনার পদক্ষেপসমূহ বর্ণনা করুন।
   অথবা, পরিকল্পনা প্রণয়নের পদক্ষেপগুলো বর্ণনা করুন।
   অথবা, কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি উত্তম পরিকল্পনা তৈরি করতে হলে যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয় সেগুলো আলোচনা করুন।
৫. পরিকল্পনার সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ লিখুন।
৬. পরিকল্পনার সমস্যা বা সীমাবদ্ধতাসমূহ কি কি?
৭. বিভিন্ন প্রকার পরিকল্পনা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা ক করুন।
   অথবা, পরিকল্পনা কাকে বলে? বিভিন্ন প্রকার পরিকল্পনার বর্ণনা দিন।
৮. একার্থক ও স্থায়ী পরিকল্পনার পার্থক্য লিখুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Short Questions)

১. পরিকল্পনা বলতে কি বোঝায়?
২. পরিকল্পনার সীমাবদ্ধতাগুলো কি কি?
৩. স্থায়ী ও একার্থক পরিকল্পনার পার্থক্য লিখুন।
৪. স্থায়ী পরিকল্পনা বলতে কি বোঝায়?
৫. লক্ষ্য কি?
৬. বিভিন্ন প্রকার পরিকল্পনা কি কি?
৭. একার্থক পরিকল্পনা কি?
৮. আদর্শ পরিকল্পনার সুবিধাগুলো কি কি?

সৃজনশীল প্রশ্ন (Creative Questions)

১. মি. রূপম একটি পোশাক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। তিনি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাধারণ নির্দেশনা অনুসরণ করেন। কিন্তু ক্রেতাদের চাহিদা ও প্রয়োজনকে গুরুত্ব দিয়ে মাঝে মাঝে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনতে হয়। সে কারণেই তিনি ব্যবসায়ে বেশ উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছেন।
   ক. সিদ্ধান্ত গ্রহণ কী?
   খ. সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা করুন।
   গ. উদ্দীপকে উল্লেখ্য মি. রুপমের সাধারণ নির্দেশনা অনুসরণ বিষয়টি কোন্ ধরনের পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত বলে আপনি মনে করেন? ব্যাখা করুন।
   ঘ. মি. রুপমের ব্যবসায়ে উন্নতির পিছনে পরিকল্পনার পরিবর্তনের গুরুত্ব মূল্যায়ন করুন।

২. জনাব এম. রাব্বানী একটি ঔষধ কোম্পানির বিক্রয় ব্যবস্থাপক। তিনি প্রতি মাসে বিক্রয়কর্মীদের নিয়ে সভা করেন। প্রতিটি কর্মীর দায়িত্ব, কর্তব্য ও বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেন। পরবর্তী সভায় প্রত্যেকের কাজের সুবিধা-অসুবিধা পর্যালোচনা করে বিভিন্ন বিষয়ে কর্মীদের পরামর্শ গ্রহণ করেন। জনাব এম. রাব্বানীর এ ধরনের কাজ কর্মীদের মনোবল বৃদ্ধি ও উৎসাহিত করছে।
   ক. নির্দেশনা কী?
   খ. নির্দেশনা কীভাবে প্রতিষ্ঠানে কর্মপ্রবাহ সৃষ্টি করে?
   গ. জনাব এম. রাব্বানীর প্রাতিষ্ঠানিক সফলতা অর্জনের কারণসমূহ বর্ণনা করুন।
   ঘ. কর্মীদের কাজের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য জনাব এম. রাব্বানী যে পদক্ষেপ নিয়েছেন তার সাথে আপনি কি একমত? আপনার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

৪. বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ কর্তৃপক্ষ ইন্টারনাল পরীক্ষা পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনতে চাচ্ছে। বর্তমানে প্রতি বিষয়ে অর্ধবার্ষিক পরীক্ষার আগে ১/২টি এবং বর্ষ সমাপনী পরীক্ষার আগে ১/২টি শ্রেণি পরীক্ষা নেয়া হয় যা ছাত্রছাত্রীদের প্রস্তুতির জন্য পর্যাপ্ত নয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিল, এখন থেকে প্রতি সপ্তাহের নির্দিষ্ট দুই দিনে দু'টি বিষয়ে কুইজ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে সব বিষয়ের উপর পরীক্ষা নেয়া হবে। কলেজ খোলা থাকা সাপেক্ষে এ কার্যক্রম চলতে থাকবে। সাধারণত ক্লাসে যখন যে চ্যাপ্টার/টপিক্স পড়ানো হবে ঠিক তার উপর এ পরীক্ষা হবে। অর্ধবার্ষিক কিংবা বর্ষ-সমাপনী পরীক্ষার আগে প্রতি বিষয়ে যে কয়টা কুইজ পরীক্ষা হবে তার ১০% নম্বর সংশ্লিষ্ট পরীক্ষায় যুক্ত হবে। কোনো ছাত্র/ছাত্রীর কুইজ পরীক্ষা এবং ক্লাসে উপস্থিতি ৮০% না থাকলে তাকে ট্রান্সফার নিয়ে কলেজ থেকে চলে যেতে বলা হবে।

ক. লক্ষ্য কী?

খ. পরিকল্পনাকে কাজের ভিত্তি বলা হয় কেন?

গ. বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ কর্তৃপক্ষের নতুন পরিকল্পনার ধরণ ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তে উত্তম পরিকল্পনার যে গুণ রয়েছে তার কার্যকর ফল পাওয়া যাবে- উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন।

৫. রায়হান সদ্য এমবিএ পাস করা একজন যুবক। আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের নিকট থেকে টাকা ধার নিয়ে সে ঢাকাস্থ গ্রীন রোডে ঘরণী নামে একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোর স্থাপন করে। ব্যবসায় পরিচালনার জন্য একজন ম্যানেজার ও চারজন কর্মচারী নিয়োগ করে। ক্রয়-বিক্রয় ভাল হওয়ায় সে কর্মচারীদের ওপর আস্থা রাখে। কিন্তু বছর শেষে হিসাব করে দেখে প্রচুর লোকসান হয়েছে।

ক. কৌশলগত পরিকল্পনা কী?

খ. সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াটি উল্লেখ করুন।

গ. রায়হানের ব্যবসায় লোকসানের কারণ কী? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. রায়হান কীভাবে তার লোকসান কাটিয়ে উঠতে পারে– আপনার মতামত দিন।

৬. জনাব তাহসান পূর্ব থেকে মূলধন ও ব্যয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা না নিয়ে একটি রেষ্টুরেন্ট স্থাপন করেন। রেস্টুরেন্ট চালু হওয়ার শুরুতেই তিনি আর্থিক সংকটে পড়েন। বন্ধু-বান্ধবের সহায়তায় তিনি নতুন করে মূলধন বিনিয়োগ ও তদারকি বাড়িয়ে রেষ্টুরেন্ট সচল করার চিন্তা করেন।

ক. সামগ্রিক পরিকল্পনা কী?

খ. পরিকল্পনায় কেন আঙ্গিনা স্থাপন জরুরী?

গ. তাহসান রেস্টুরেন্ট ব্যবসায় স্থাপনে পরিকল্পনার কোন্ ধাপটি অনুসরণ করেননি?– ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. স্বল্পমেয়াদী ঋণ কত সময়ের জন্য নেয়া যায়?

৭. ধরুন, জনাব ঈমান ও জনাব মাহি ঢাকায় অবস্থিত ঔষধ প্রস্তুতকারক ACI কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। সম্প্রতি খুলনায় বিক্রয় প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কনফারেন্সে প্রশিক্ষক হিসেবে তারা দুজন দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। জনাব ঈমান খুলনায় যাওয়ার পথ বিবেচনা করে আকাশ পথে খুলনা যান এবং যথাসময়ে কনফারেন্সে যোগ দেন। অপরদিকে জনাব মাহি যানজটে আটকা পড়ার কারণে কনফারেন্সে যোগ দিতে পারেননি।

ক. আনুষ্ঠানিক পরিকল্পনা কী?

খ. নীতি বলতে কী বোঝায়?

গ. জনাব মাহি কনফারেন্সে যোগ দিতে না পারার পিছনে সঠিক পরিকল্পনার কোন্ বিষয়টির অনুপস্থিতি দায়ী? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. উত্তম বিকল্প পন্থা গ্রহণ করেছেন বলেই জনাব ঈশান কনফারেন্সে যোগ দিতে পেরেছেন - বিশ্লেষণ করুন।

৮. বনানীতে অবস্থিত ‘চৌতি’ নামে একটি মেগাশপের মালিক মিনু আহমেদ। তিনি গত বছর ব্যবসায় প্রচুর টাকা মুনাফা অর্জন করায় একটি স্পিনিং মিল প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন। এ লক্ষ্যে গাজীপুরে জমি কিনে স্পিনিং মিল চালু করেন। পরিবার, নিকট আত্মীয়, বন্ধু বান্ধব সবাই তাকে নতুন ব্যবসায়টি সম্পর্কে ধারণা নিয়ে কাজ করতে বলেন। কিন্তু তিনি বলেন, টাকা থাকলেই সব হয়, কোনো তথ্য বা ধারণার প্রয়োজন নেই। স্পিনিং মিলটি চালুর ছয় মাসের মধ্যে মিনু আহমেদ তা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন।

ক. স্ট্রাটেজি কী?

খ. একার্থক পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায়?

গ. মিনু আহমেদের গৃহীত সিদ্ধান্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. যেকোনো ব্যবসায় পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ- উক্তিটি উদ্দীপকের আলোকে আলোচনা করুন।

উত্তরমালা:

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.১ :	১.ক	২.খ	৩.ক	৪.খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.২ :	১.গ	২.খ	৩.খ	৪.ক	৫.ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৩ :	১.খ	২.খ	৩.ঘ	৪.খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৪ :	১.ঘ				